গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা | ২২ - ২৮ এপ্রিল ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষণ ব্যবস্থার সাথে আপস করে মর্যাদা অর্জন করা যায় না

শিবদাস ঘোষ

''আপনারা কি এই কথাটার মানে বোঝেন যে, ইউ ক্যানট ফাইট ফর ইওর ওন ফ্রিডম উইদাউট ফাইটিং ফর দ্য ফ্রিডম অফ আদারস। আগেও বহু ক্লাসে একথা আপনাদের বলেছি—এই ফ্রিডম কথাটা বুঝতে হবে কী ভাবে? বুঝতে হবে—তুমি যদি নিজে বিকাশলাভ করতে চাও, সমাজ বিকাশের জন্য তোমার যদি উদ্বেগ এবং আকাঙ্খা থাকে, সংস্কৃতিসম্পন্ন, রুচিসম্পন্ন, শালীনতা এবং মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাপন করতে যথার্থই যদি তুমি চাও এবং মর্যাদা সম্পর্কে তোমার যদি কোনও ভ্রান্ত ধারণা না থাকে, মর্যাদা মানে টাকাপয়সা, মর্যাদা মানে আইসিএস অফিসার হওয়া, মর্যাদা মানে হাইকোর্টের জজ হওয়া, মর্যাদা মানে

তিনের পাতায় দেখুন

গতকালের প্রতিবাদী আজ ধর্ষকের পক্ষে সওয়াল করছেন। কেন?

ক্ষমতার দম্ভ কি মানুষকে অন্ধ করে দেয়? সব শাসকের চরিত্রই কি তবে এক? রাজ্যের মানুষের মুখে মুখে আজ এমন অজস্র প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদীয়ার হাঁসখালিতে নির্যাতনে নিহত কিশোরী সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় মন্তব্য করেছেন তাতে সমাজের বড় অংশই স্তম্ভিত এবং ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর মুখ দিয়ে এমন ভাষা বেরোল কী করে? বিরোধী অবস্থায় থাকাকালীন যে মুখ্যমন্ত্রীকে এ ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করতে দেখা যেত, মাঝরাতেও ছুটে গিয়ে নির্যাতিতের পাশে দাঁড়াতে দেখা যেত, তিনিই আজ ধর্ষকের পক্ষে সওয়াল করছেন কী করে?

অতীতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে ভূমিকা দেখে যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর উপর ভরসা করেছিলেন, তাঁর চরিত্রের এই পরিবর্তনে তাঁরাও বিস্মিত হচ্ছেন। রাজ্যে একের পর এক খুন-ধর্ষণ-নারী নির্যাতনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন, তা আর যাই হোক, প্রশাসনিক প্রধানের উপযুক্ত নয়। বগটুইয়ের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এতে তাঁর দলের কোনও দায় নেই। এটি দু'দল দুষ্কৃতীর বিরোধের ফল। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বহিষ্কৃত ছাত্রনেতার গালিগালাজে যখন রাজ্যের বিবেকবান মানুষ মাত্রেই লজ্জায় অপমানে মাথা

দুয়ের পাতায় দেখুন

১৫ এপ্রিল কার্শিয়াং-এ এক আশাকর্মীর ওপর পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে কলকাতার ধর্মতলায় বিক্ষোভ আশাকর্মীদের। ১৭ এপ্রিল

পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি

কোন দায়িত্বটা পালন করছে বিজেপি সরকার

পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের প্রতিদিন লাফিয়ে দামবৃদ্ধি দেখলে মনে হয় না দেশে কোনও সরকার আছে। সরকারের ভাব দেখলে মনে হয় কর্পোরেট তেল কোম্পানিগুলি দাম যেমন খুশি বাড়িয়ে জনজীবন স্তব্ধ করে দিলেও তাদের কিছু করার নেই। তাহলে সরকারটা কী জন্য? যে ভাবে চলছে তাতে পরিষ্কার কর্পোরেটরাই দেশ চালাচ্ছে, আর সরকারের কাজ তাদের সেবা করা। কর্মহীন, আশ্রয়হীন গরিব-নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ, ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিতে। তার সাথে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ায়, পরিবহণ সহ সমস্ত কিছুর দাম আবারও বাড়ায় তারা আগুন দামে পুড়ছে। তাদের পিঠে আরও বোঝা চাপিয়ে পুঁজিমালিকদের আরও লাভের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সরকার।

পেট্রোপণ্যের দামবৃদ্ধির কারণ কী? সরকারের প্রতি বারের ফাটা রেকর্ড—বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে, ফলে তাদের কিছু নাকি করার নেই। এর সাথে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অজুহাত দেওয়া চলছে। বলা হচ্ছে এই যুদ্ধের জন্যই তেলের দাম বাড়ছে।

দেখা যাক, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি। কত দাম বেড়েছে বিশ্ববাজারে? ২০১৪ সালে বিজেপি যখন দিল্লির সরকারে বসে, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল (ব্রেন্ট ক্রুড)-এর দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ৯৩.১৭ ডলার। ২০২২-এ দাম ব্যারেল প্রতি ৯৮.২২ ডলার (১১ এপ্রিল), আর এক অশোধিত তেল ডব্লিউটিআই ৯৩.৬৩ ডলার। বেড়েছে কত? ব্রেন্ট ক্রুড বেড়েছে ৫.০৫ ডলার। সেই অনুপাতে পেট্রল-ডিজেলের দাম কত বেড়েছে? ২০১৪ সালে ভারতে প্রতি লিটার পেট্রলের দাম ছিল ৬৬.০৯ টাকা, ২০২২-এ তা দাঁড়িয়েছে ১১৫.১২ টাকা (লেখা পর্যন্ত)। আর ডিজেলের দাম কত বেড়েছে? ২০১৪-তে ডিজেলের দাম ছিল ৫০.৩২ টাকা লিটার। ২০২২-এ দাম ১০০ টাকা (লেখা পর্যন্ত)। কেন ভারতে এত বৃদ্ধি? গত

পাঁচের পাতায় দেখুন

শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি

মুখ্যমন্ত্রী, বদল হল কই!

রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এসএসসি-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ এবং গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে এবং বিচারকের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছে। এই মামলায় বিচারপতির বিভিন্ন নির্দেশের বিরুদ্ধে তৃণমূল সমর্থক একদল আইনজীবী কোর্টে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। অন্যদিকে সিবিআই, যাকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল 'খাঁচার তোতা', তারা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্তাদের প্রভাব এড়িয়ে কতটা স্বাধীনভাবে তদন্ত প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করতে পারবে, না কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে—এই আশঙ্কাও রয়েছে। মানুষ চাইছে সত্য বেরিয়ে আসুক, অপরাধী সাজা পাক। সাথে সাথে মানুষের মনে যে প্রশ্নটি ধাক্কা দিচ্ছে তা হল, দুর্নীতি কি তবে সব সরকারের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল? এর থেকে বেরোনোর কি কোনও উপায় নেই?

সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে নবম-দশম শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির এই অভিযোগ। সংবাদে প্রকাশ, ৭২ রকম দুর্নীতি বা অনিয়ম নাকি হয়েছে! তার মধ্যে রয়েছে বেশি নম্বর পাওয়া প্রার্থীকে টপকে কম নম্বর পাওয়া প্রার্থীকে নিয়োগপত্র দেওয়া। আরও অভিযোগ উঠেছে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি-তে নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকরির পরীক্ষায় পাশও করেনি, এমন সব প্রার্থীদের নিয়োগ করা হয়েছে। এর পিছনে কোটি কোটি টাকা ঘুষের কারবারের অভিযোগও আছে। এবারই প্রথম নয়, কয়েক বছর আগে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাদের বিরুদ্ধে লাখ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ১১ বছরের শাসনে কোটি কোটি টাকার সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হয়েছে।

চারের পাতায় দেখুন

ধর্ষকের পক্ষে সওয়াল করছেন কেন?

একের পাতার পর

নিচু করছেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী তাকে শুধুই ‘একটু কটু কথা’ বলে দায়িত্ব শেষ করেছেন। আর হাঁসখালির ঘটনাকে তো শুধু ‘ছোট ঘটনা’ বলেই থামেননি, নিহত কিশোরীর চরিত্র নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে প্রশ্ন উঠে আসছে, সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রবল বিক্ষোভের ঢেউয়ে ভেসে যিনি ক্ষমতায় বসেছিলেন, ক্ষমতায় বসার কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর এই পরিণতি হল কেন? সিপিএম শাসনেও রাজ্যের মানুষ দেখেছেন, একদিন যাঁরা দিন বদলের কথা বলেছেন, ক্ষমতায় বসে তাঁরাই কী ভাবে জনবিরোধী শাসকে পরিণত হয়েছেন। তবে কি শাসক মাত্রেরই এই পরিণতি?

আসলে যতদিন কেউ মানুষের পক্ষে থাকেন, তাদের অভাব-অভিযোগের সুরাহার দাবির সাথে থাকেন, তত দিন তাঁর ভাষাও থাকে মানুষের পক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সম্পর্কে দেশের মানুষের মনে যে ধারণাটি গড়ে উঠেছিল তা তাঁর ক্ষমতায় বসার আগেকার ধারণা।

এ কথা কোনও ভাবেই ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা বাস করি শোষক এবং শোষিত শ্রেণিতে বিভক্ত পুঁজিবাদী একটি সমাজে। এখানে প্রতিটি মানুষই হয় শোষকের পক্ষে না হয় শোষিতের পক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী যতদিন সাধারণ মানুষের পক্ষে থেকেছেন, ততদিন তিনি ‘প্রতিবাদী’ হিসাবে পরিচিত থেকেছেন। যেদিন তিনি শাসন ক্ষমতায় বসে শোষণের রাজদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছেন, শোষক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন সেদিনই তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ক্ষমতায় বসেই তিনি শোষকের পক্ষ নিয়েছেন তার প্রমাণ কী? যে মুখ্যমন্ত্রী সিপিএমের অপশাসনের বিরোধিতা করতে গিয়ে একের পর এক বনধ ডেকেছেন, ক্ষমতায় বসে তিনিই মালিক শ্রেণিকে সন্তুষ্ট করতে, তাদের সেবায় নিজেকে দায়িত্বশীল প্রমাণ করতে ঘোষণা করেছেন, রাজ্যে কোনও বনধ-ধর্মঘট বরদাস্ত করা হবে না। অর্থাৎ কোনও সরকার যদি জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়, তার প্রতিরোধের প্রয়োজনে অস্ত্র হিসাবে যদি মানুষ বনধ-ধর্মঘট করে, তবুও তিনি তার বিরোধিতা করবেন। আর আজ তো তিনি শুধু বনধ-ধর্মঘটের বিরোধিতাতেই সীমাবদ্ধ নেই, শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় গণআন্দোলন দমনে নতুন নতুন পন্থা নিয়ে চলেছেন।

ফলে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দোসরদের প্রশ্রয়ে পুষ্ট এই বিশাল বাহিনী, যারা সরকারের মধুভাণ্ডের ভাগ পেতে তৃণমূলের চারপাশে জড়ো হয়েছে, তারা তো দুষ্কর্মই ঘটাবে। সেই দুষ্কর্মই আজ ঘটে চলেছে রাজ্য জুড়ে। চলছে শাসকদলের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব, খুনোখুনি, মহিলাদের উপর লাগাতার অত্যাচার, ধর্ষণ, খুন, বালি-পাথর-কয়লা খাদানকে কেন্দ্র করে বেআইনি লুটপাঠ। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এখন রাজ্যে সবাই তৃণমূলের সমর্থক। সকলেই যদি তৃণমূলের সমর্থক হয় তবে তাদের কুকীর্তির দায় তাদের নেত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী এড়াবেন কী করে? তিনি তো রাজ্যের মানুষকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় বসেছিলেন যে, সিপিএম অপশাসনের বিরুদ্ধে সুশাসন দেবেন। তবে কেন রাজ্যের যুবসমাজের একটা বড় অংশ আজ নানা রকমের অনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ছে? এর উত্তর দেওয়ার দায় তো মুখ্যমন্ত্রীর উপরই বর্তায়।

মুখ্যমন্ত্রী চুপ করে থাকলেও রাজ্যের মানুষ জানেন, ক্ষমতায় বসার পর যখন সিপিএম জমানার খুন-সন্ত্রাস-চুরি-দুর্নীতির নায়করা বানের জলের মতো তৃণমূল কংগ্রেসে ঢুকছিল তখন তিনি শুধু বাধা দেননি তাই নয়, মানুষের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, তারা নাকি সংগঠন তৈরিতে অভিজ্ঞ। ক্ষমতায় বসে যেদিন তিনি সিপিএমের মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্সের নীতিকে আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চললেন, সেদিনই বোঝা গিয়েছিল ছাত্র-যুবদের নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলা বা তা রক্ষা করায় নেত্রীর কোনও দায় নেই। কামদুনিতে এক কিশোরীর উপর অত্যাচার করে খুনের ঘটনায় প্রতিবাদীদের যেদিন ‘মাওবাদী’ বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন সেদিনই বোঝা গিয়েছিল ক্ষমতায় বসার আগে তাঁর এমন ঘটনার বিরোধিতার মধ্যে কোনও নৈতিক তাগিদ ছিল না, মানুষের ক্ষোভকে ক্ষমতার সিঁড়ি বানানোই ছিল আসল উদ্দেশ্য। একের পর এক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএমসি-র ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা যখন শিক্ষক-অধ্যক্ষ-উপাচার্যদের অপমান করতে থাকল এবং মুখ্যমন্ত্রী সেগুলিকে ‘দুষ্টু ছেলেদের কাজ’ বলে উড়িয়ে দিলেন তখনই বোঝা গিয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য এই সব ছাত্রযুবদের হীন কাজে ব্যবহার করা। তারই প্রতিফলন ঘটল ঠিক সিপিএমের কায়দাতে একের পর এক নির্বাচনে এই ছাত্রযুবদের ব্যবহার করে জাল ভোট, ছাপ্পা ভোট দেওয়া, রিগিং করা, বুথ দখল করার ঘটনায়।

মুখে মানুষের কল্যাণের কথা বলা আর কাজে ছাত্র এবং যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তাদের লুম্পেন হিসেবে তৈরি করা সুবিধাবাদী রাজনীতির এক চরম উদাহরণ। এই রাজনীতির চর্চা হলে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য, মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা সমাজে বাড়তে বাধ্য। দুর্নীতি-দুষ্কৃতী-লুঠতরাজের রাজনীতিতে রুচি-সংস্কৃতির জায়গা থাকতে পারে না। আর রাজনীতিতে যদি রুচি-সংস্কৃতি না থাকে তবে তা কখনও মানুষের যথার্থ কল্যাণ করতে পারে না। ঠিক এই কারণেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজনীতিতে রুচি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধের উপর এত জোর দেয়। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের রাজনীতির মধ্যে যদি রুচি-সংস্কৃতির প্রতিফলন না থাকে, তা হলে তাদের রাজনীতির কথাগুলো কতগুলো শুকনো কথার কচকচিতে পরিণত হয়, তা মানুষের যথার্থ কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হতে পারে না। সেই রাজনীতি মুখে জনদরদের ফোয়ারা ছোটালেও তা আসলে ভণ্ডদের রাজনীতি, যা সমগ্র রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবেশকে দূষিত করে। সেই জিনিসই আজ রাজ্য জুড়ে ঘটে চলেছে।

একদিন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর মুখে কিছু স্লোগান শুনে অনেকে তাঁকে বামপন্থী বলে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে এক দল মানুষ আছেন যাঁরা কারও মুখে কিছু র‍্যাডিক্যাল স্লোগান শুনলেই তাকে বামপন্থী বলে মনে করেন। মমতা ব্যানার্জীকেও তাই মনে করেছিলেন। অথচ বামপন্থা কথাটার তো একটা নির্দিষ্ট মানে আছে। বামপন্থী মানে তো তিনি শ্রেণি-রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের সমস্ত সমস্যার মূল এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এর আমূল পরিবর্তন ছাড়া যথার্থ গণমুক্তি সম্ভব নয়। মমতা ব্যানার্জীর রাজনীতিতে এসবের চিহ্নমাত্র আছে নাকি? বরং তিনি শ্রেণিরাজনীতিরই বিরোধিতা করেন। এতবড় একটা কৃষক আন্দোলন দিল্লিতে হয়ে গেল, কৃষকদের স্বার্থে সেই আন্দোলনকে জোরদার করার কোনও চেষ্টা তৃণমূল কংগ্রেস করেছে নাকি? শিক্ষাক্ষেত্রে বিজেপি মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনছে, শিক্ষার সিলেবাসে অনৈতিহাসিক সব বিষয় নিয়ে এসে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছে। তার কোনও বিরোধিতা মুখ্যমন্ত্রীর দল বা সরকার করেছে? বরং জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতিকেই নানা চালাকির মধ্য দিয়ে এ রাজ্যে চালু করছে। কোনও দলের রাজনীতিতে যদি মানুষের উপর শাসক শ্রেণির আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না থাকে, আন্দোলন না থাকে তবে তা মানুষকে বিপথগামী করে এবং এর ফলে ব্যক্তি নেতাদেরও এক সময়ের অর্জিত চরিত্র অধোগামী হতে বাধ্য। শাসক তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের বর্তমান পরিণতি এই কারণেই।

সিপিএম নেতারা আজ তৃণমূলের দুষ্কৃতী-রাজ দেখিয়ে নিজেরা ভালো সাজতে চাইছেন। অথচ ৩৪ বছর শাসন ক্ষমতায় তাঁদেরও যে একই পরিণতি ঘটেছিল তা-ও ছিল জনবিরোধী রাজনীতি এবং সংগ্রাম

তিনের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রবীণ সদস্য কমরেড রতন সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল হৃদরোগে শয্যাশায়ী থাকার পর ৫ এপ্রিল রাতে যাদবপুরে নিজ বাসভবনে ৯০ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৬ এপ্রিল তাঁর মরদেহ পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটব্যুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য সহ উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। মরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

কমরেড রতন সেনগুপ্ত কলকাতার বিবাদী বাগ অঞ্চলে চায়ের একটি নিলাম কোম্পানিতে বড়বাবু হিসাবে কাজ করতেন। সেখানেই জয়নগরের প্রবীণ সদস্য কমরেড সুধীর ব্যানার্জীও কাজ করতেন। উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কমরেড রতন সেনগুপ্ত ধীরে ধীরে দলের নীতি-আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। ওই সময়ই তাঁকে একদিন গণদাবী প্রেসে প্রয়াত পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জীর কাছে নিয়ে আসেন কমরেড সুধীর ব্যানার্জী। শচীন ব্যানার্জীর চরিত্রের মাধুর্য, স্নেহশীলতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কমরেড রতন সেনগুপ্তকে পার্টির কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। কমরেড শচীন ব্যানার্জী তাঁকে সাপ্তাহিক ‘অন্যচোখে’ পত্রিকা দেখভাল করার দায়িত্ব দেন। কমরেড রতন সেনগুপ্তের কর্মনিষ্ঠা ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। তিনি তৎক্ষণাৎ ওই কাগজকে কী ভাবে সবদিক দিয়ে সুন্দর ও অর্থবহ করা যায় তার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করতে থাকেন। গণদাবী প্রেসের একটি কোণায় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট টেবিলে তিনি প্রত্যহ অফিস ছুটির পরে চলে আসতেন এবং রাত পর্যন্ত সেখানে থাকতেন। ধীরে ধীরে তিনি ওই পত্রিকার কাজের পরিধি ছাড়িয়ে নিজগুণে দলের আভ্যন্তরীণ জীবনে প্রবেশ করেন এবং বহু রকম কাজের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেন। নিখুঁত কাজ করার প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। শরৎচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে ‘গোল্ডেন বুক অফ শরৎচন্দ্র’ প্রকাশনার বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলেন। ১৯৯৩ সালে ‘গোল্ডেন বুক অফ বিদ্যাসাগর’ প্রকাশেও মুদ্রণের দিকটি তাঁর তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়েছিল এবং এই পুস্তকটি পাঠকমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী কালে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে যখন অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম গঠিত হয়, তিনি তার অফিস সম্পাদকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। কর্মনিষ্ঠা, রসিক মন, দায়িত্বশীলতা ও কঠিন পরিশ্রম সবকিছু মিলে কমরেড রতন সেনগুপ্ত পার্টির নেতা-কর্মী সকল স্তরেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। বয়স ধীরে ধীরে তাঁর কর্মক্ষমতা কেড়ে নিতে থাকে। তিনি হার্টের নানা অসুখে আক্রান্ত হন, যা তাঁকে ক্রমেই ঘরবন্দি করে ফেলে। কিন্তু দল ও কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে তিনি সর্বদা অন্তরে শ্রদ্ধার সঙ্গে পোষণ করেছেন এবং যথাসাধ্য অনুসরণ করারও চেষ্টা করেছেন। পরিণত বয়সে জীবনাবসান ঘটলেও এ ধরনের মানুষদের অনুপস্থিতি সামাজিক আন্দোলনের পক্ষে একটা ক্ষতি। ১৮ এপ্রিল কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কমরেড ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় মূল বক্তব্য রাখেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী।

কমরেড রতন সেনগুপ্ত লাল সেলাম

শোষণ ব্যবস্থার সাথে আপস করে মর্যাদা অর্জন করা যায় না

কমরেড শিবদাস ঘোষের আহ্বান

একের পাতার পর

মিনিস্টার হওয়া, চিফ মিনিস্টার হওয়া, মর্যাদা মানে অ্যামবাসাডর হওয়া এবং গাড়িবাড়ি থাকা; লোকে আমাকে স্যার স্যার বলবে, এইরকম তোমার যদি ভাবনা না থাকে, মর্যাদা কথাটার যথার্থ উপলব্ধি যদি তোমার থাকে তা হলে এ সমাজে তার একটাই মানে। সেটা হচ্ছে, এই সমাজে যদি সত্যিই মর্যাদার সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে নিজের মাথা উঁচু করে বিবেকের অনুশাসন অনুযায়ী চলতে চাও, তাহলে, 'দ্য ওনলি ওয়ে টু লিড ইওর লাইফ ইন অনারেবল ওয়ে ইজ টু এনগেজ ইওরসেলভস কনস্ট্যান্টলি ইন দ্য স্ট্রাগল অফ দ্য মাসেস ফর জাস্টিস।' ইনজাস্টিসের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং তাকে নিয়ে লড়াই করা এবং এই লড়াই সংগঠিত করার কাজে এবং সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্য দিয়েই তুমি একমাত্র মর্যাদা এবং ডিগনিটিসম্পন্ন জীবনযাপন করতে পারো। বাকি সমস্ত রাস্তা সব সেল্ফ ডিসেপশন, মর্যাদার নয়— অহম। কারণ এ সমাজে ওয়াগন ব্রেকারের টাকায় সম্পত্তি করলেও মর্যাদা মেলে, ফুলের মালা মেলে। ডাকাতি-গুণ্ডামির পয়সায় টাকা-কড়ি হলে তারও কদর হয়। তারপরে সে এমএলএ, এমপি হয়, আর তা হয় পয়সার জোরে। তারপরে সে মিনিস্টার হয়। তারপরে তিনি বাণী দিতে থাকেন। তা তিনি যদি এসব ঠুনকো মর্যাদায় আত্মসন্তুষ্টি পান তা হলে ফ্রিডম নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার কী?

কেউ ভাবতে পারে, আমি একটু লেখাপড়া শিখে ডাক্তার হব, এটা অনারেবল ওয়ে। কিন্তু ডাক্তার হলেও তো হবে না। কারণ এই সমাজে ডাক্তার যদি 'এথিক্স অফ মেডিকেল সায়েন্স'কে আপহোল্ড করে, ডাক্তারের নোবেল লাইফ লিড করতে চায়, তা হলে তাকে না খেয়ে থাকতে হবে। তার দ্বারা প্র্যাক্টিস হবে না এবং সে নামও করতে পারবে না এবং টাকাপয়সাও তার হবে না। কেউ তাকে ব্যাক করবে না। সে একটা পাগল বলে গণ্য হবে। সর্বস্তরে তার রীতিনীতি, নৈতিকতা, মেডিকেল এথিক্স নিয়ে সংঘর্ষ হবে। ফলে সে কিছুই করতে পারবে না। তা হলে মেডিকেল এথিক্স বা বিজ্ঞানের যে এথিক্স, একজন বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ার বা কেমিস্ট হোক বা ফিজিক্সের ছাত্র হোক, তার কোনও কিছু পরোয়া না করে হোয়াট ইজ দ্যা এথিক্স অফ সায়েন্স, তার পরোয়া না করে তিনি যদি নিজেকে গোলাম, চাকুরিজীবীতে পর্যবসিত করেন, পয়সার বিনিময়ে টাটার কাছে, না হয় বিড়লার কাছে, না হয় কোনও ফার্মের কাছে, না হয় গভর্নমেন্টের কাছে, নিজের বিবেক বিক্রি করেন, হ্যাঁ তা হলে তার পয়সা হবে, নাম হবে। এই তো? তা হলে সে যদি ভাবে যে না না, আমি তো ওয়াগান ব্রেকিং করে বা রেস খেলে বা গুণ্ডাদল তৈরি করে টাকা করে তো নাম করিনি, আমি ডাক্তারি করে নাম করেছি, ফাঁকি দিয়ে নয়। কিন্তু তুমি কি জানো যে, শুধু ডাক্তারি করে নাম করোনি। ডাক্তারির সঙ্গে তুমি গোলামি করেছ, তোষামোদি করেছ। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে গোলামি করেছ, তোষামোদি করেছ। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেছ। মানব সভ্যতার চরম দুষমনদের কুকার্যগুলোকে চুপ করে থেকে হজম করেছ। তাদের কাছে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান বিকিয়ে দিয়েছ। তবে তুমি পয়সা করেছ। এর নাম কি মর্যাদা? এই মর্যাদার জন্য সিদ্ধার্থবাবুর দল দৌড়চ্ছে, অন্য দলগুলো দৌড়চ্ছে।

পৃথিবীতে দু-দল মানুষ আছে। একদল মানুষ ঠুনকো মর্যাদার জন্য দৌড়তে থাকে। আর এক দল মর্যাদা বলতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস মনে করে। মনে করে বিবেকের দংশন কী করতে বলে, মনে করে সত্যিকারের প্রগতি আছে সেখানে যেখানে সমাজের অগ্রগতি নিহিত রয়েছে। যে অগ্রগতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষকে তার কূপমণ্ডুকতা, দুর্বলতা, লোভ, ভয়, ভীতি থেকে মুক্ত করা এবং সেই রাস্তায় মাথা উঁচু করে সংগ্রাম করা। সমাজকে শোষণমূলক অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া। সমাজের পরিবর্তন আনা। আর সমাজের এই পরিবর্তন আনার মধ্য দিয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনা এবং তার বিকাশের রাস্তা খুলে দেওয়া।" (শিক্ষাশিবির, ১৯৭৪)

ধর্ষকের পক্ষে সাওয়াল করছেন

দুয়ের পাতার পর

বিমুখতারই ফল। গত শতকের পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকের গোড়ায় তাঁদের নেতা-কর্মীদের মধ্যেও সংগ্রামী মানসিকতা ছিল। কারণ তাঁরা তখন গণআন্দোলনে সামিল ছিলেন। কিন্তু ছয়ের দশকে যখন এ রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হল এবং তাঁরা তার অন্যতম শরিক হয়ে ক্ষমতার রাজনীতির স্বাদ পেলেন তখনই তাঁরা সংগ্রামী রাজনীতির রাস্তা পরিত্যাগ করলেন। যে-কোনও রকম শ্রেণি-রাজনীতিকে, আপসহীন রাজনীতিকে তাঁরা এড়াতে থাকলেন যাতে পুঁজিপতি শ্রেণির বিষনজরে না পড়েন, যাতে তাঁদের ক্ষমতায় থাকতে, আবার ক্ষমতায় বসতে পুঁজিপতি শ্রেণির আশীর্বাদ পেতে কোনও অসুবিধা না হয়। সেই রাজনীতিই তাঁরা ক্ষমতায় থাকার ৩৪ বছর ধরে করেছেন, আজও করে চলেছেন। আজও শ্রেণি-রাজনীতিকে এড়িয়ে, গণসংগ্রামের রাজনীতিকে এড়িয়ে কোথায় কোন দলের সাথে জোট করলে—তা বুর্জোয়া দল হোক, জাতপাতভিত্তিক দল হোক—দুটো এমএলএ বা এমপি জোটানো যায়, সেই রাজনীতিই করে চলেছেন।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই আদর্শহীনতাই আজ সবচেয়ে বড় সঙ্কট। তাই একদিনের সংগ্রামী বলে পরিচিত নেতা বা নেত্রী আর একদিন নীতিহীন, সুবিধাবাদী, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকে পরিণত হন। অগণিত সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণা তখন আর এঁদের বুকে ঢেউ তোলে না। দেশের মানুষ সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে গেলেও এই সব নেতানেত্রীরা নির্বিকার থাকেন, ডুবে থাকেন গদি দখলের লড়াইতে। মানুষ তাদের কাছে পরিণত হয় শুধু এক একজন ভোটারে। ক্ষমতার রাজনীতির এই পঙ্কিল আবর্তের সম্পূর্ণ বিপরীতে, উন্নত নীতি-আদর্শকে ভিত্তি করে সংগ্রামী বামপন্থার পতাকা হাতে আজ গণআন্দোলনের ময়দানে রয়েছে একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা এ যুগের অন্যতম মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদই মানুষের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার কারণ এবং একই সাথে নীতিহীন রাজনীতির মূল উৎস। তাই এই পচা-গলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নানা ছলে-কৌশলে টিকিয়ে রাখার রাজনীতি কখনওই মানুষকে যথার্থ মুক্তির রাস্তা দেখাতে পারে না। বরং যে দল, যে নেতা এই ব্যবস্থার সেবা করবে, নানা ছলে তাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে, তারা নীতিহীন হতে বাধ্য। আজ মানুষকে মানুষের মতো মাথা তুলে বাঁচার এবং পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল থেকে মুক্তির সঠিক রাস্তা দেখাতে পারে একমাত্র যথার্থ বিপ্লবী দল এবং তার কমিউনিস্ট রাজনীতি।

তাই আজ যারা রাজনীতির নীতিহীনতা এবং সমাজের প্রবল অবক্ষয় দেখে দুঃখ পাচ্ছেন, উদ্বিগ্ন হচ্ছেন এবং এর হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার কথা ভাবছেন, ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে সামিল হওয়া এবং সংগ্রামী বামপন্থী রাজনীতি-সংস্কৃতির ধারাকে শক্তিশালী করা ছাড়া তাদের সামনে অন্য কোনও রাস্তা নেই।

দেশের আদালতে গরিব মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়া কঠিন বললেন ওড়িশার প্রধান বিচারপতি

"এ দেশের আদালতে গরিব মানুষের পক্ষে বিচার পাওয়া কঠিন। এই বিচারব্যবস্থা ধনী ও গরিবকে সমান দৃষ্টিতে দেখে না।"—মন্তব্য ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস মুরলীধর-এর।

বৈষম্যবিরোধী একটি সংগঠন আয়োজিত আলোচনাসভায় গত ১৪ এপ্রিল বিচারপতি মুরলীধর এ দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, আদালতে ন্যায়বিচার পেতে এদেশে প্রান্তিক মানুষদের অনেক বাধার সামনে পড়তে হয়। এমনকি শিক্ষিত মানুষের কাছেও এদেশের আইন-কানুন এবং বিচারপদ্ধতি রহস্যময় ঠেকে। এই বিচারব্যবস্থা ধনীর জন্য একরকম আর গরিবের জন্য আর একরকম ভাবে কাজ করে। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি দেখান, বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তফসিলি জাতি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে যাঁরা সমাজের নীচের তলার।

লিগাল এইড সার্ভিস সম্পর্কে বিচারপতি মুরলীধর মন্তব্য করেন, এখান থেকে পাওয়া বিনামূল্যের পরিষেবা যেন রেশন দোকান থেকে পাওয়া জিনিসপত্রের মতো, যার মান ভালো হবে বলে কেউ আশা করে না। কারণ, কম দামে বা বিনামূল্যে কিছু পাওয়াকে এ দেশের গরিব মানুষ নিজেদের অধিকার বলে ভাবতে পারেন না, ভাবেন এটা রাষ্ট্রের দয়া-দাক্ষিণ্য। তিনি বলেন, তফসিলি জাতি-উপজাতির মানুষ, দলিত, আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু কিংবা সামাজিক ও আর্থিক ভাবে এবং শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা মানুষ, আদালতে যথেষ্ট বৈষম্যের শিকার হন। ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তিতে যুক্ত মানুষজনকে এবং মানসিক ভাবে অসুস্থ কিংবা ফুটপাতবাসীদের সাধারণ আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা বলেই ভাবা হয়। এদের ক্ষেত্রে আদালতের আচরণ হয় বৈষম্যমূলক। ফলে এঁদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলো আরও কঠিন হয়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতি দূর করতে সদিচ্ছা ও সদর্থক নীতি নিয়ে রাষ্ট্রের এগিয়ে আসা উচিত বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি। কিন্তু ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই জানেন, বর্তমান শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধনী-গরিবের এই বৈষম্য সমাজের কোনও ক্ষেত্র থেকেই দূর করা সম্ভব নয়। সাম্যের জয়ধ্বনি দিয়ে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জন্ম হলেও, নিজের শোষণমূলক চরিত্রের জন্য শুরু থেকেই এই ব্যবস্থায় বৈষম্য মাথা চাড়া দিয়েছে।

বিকাশের যুগ পার হয়ে এই ব্যবস্থা আজ যখন মরতে বসেছে, তখন অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ সহ সর্বক্ষেত্রেই ধনী-গরিবে বৈষম্য এক বীভৎস রূপ নিয়েছে। হাজারো সদিচ্ছা থাকলেও এই রাষ্ট্রকাঠামো বজায় রেখে আইন-ব্যবস্থার বৈষম্য ঘোচানো সম্ভব নয়। তাই এদেশে টাকা যার, ন্যায়বিচার তার। তবে এই রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম একটি স্তম্ভের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েও বিচারপতি এস মুরলীধর যেভাবে সাহসের সাথে এই সত্য প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন, তার জন্য তিনি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

গণতন্ত্র আজ পুঁজির 'গুণ্ডাতন্ত্র'

বলছেন মার্কিন সমাজবিদরা

পুঁজি মালিকদের টাকার থলিই যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক— সেই সত্য বহুদিন আগেই মার্কসবাদীরা তুলে ধরলেও, একদল বুদ্ধিজীবী তা মানতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু এ সত্য আজ এতটাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যে গণতন্ত্রের তথাকথিত পীঠস্থান আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানীরাও আর তা অস্বীকার করতে পারছেন না।

তাঁদের কথাতেই উঠে এসেছে 'রগ বিলিওনেয়ার' বা গুণ্ডা ধনকুবের শব্দটা! হ্যাঁ, আমেরিকান বিলিওনেয়ারদের এখন এই নামেই অভিহিত করছেন সে দেশেরই সমাজবিদ্যা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা। বর্তমান ধনতান্ত্রিক বিশ্বে আমেরিকা এবং আরও অনেকগুলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের যে সব ধনকুবের অর্থের জোরে সমাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে, তাদেরই এই নামে অভিহিত করছেন তাঁরা। অর্থের জোরে এরা পছন্দের রাজনৈতিক দলের পেছনে যথেচ্ছ টাকা ঢেলে তাদের নির্বাচনে জিতিয়ে ক্ষমতায় বসাচ্ছে এবং তার মাধ্যমে গোটা অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাকে তারা নিজেদের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসছে। এমনকি এর জোরেই ন্যায়-অন্যায় বোধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধিকেও তারা গুলিয়ে দিতে সক্ষম। এজন্যই তাদের অর্থবলকে বলা হচ্ছে— স্রেফ গুণ্ডামি।

কানাডার রাষ্ট্রনীতিবিদ টমাস হোমার ডিক্সন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতিবিদ থেডকা স্কোকপল প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী এর নাম দিয়েছেন 'ডার্টি মানি' বা 'নোংরা টাকা'। অর্থাৎ যে টাকার জোরে দিনকে রাত করা হচ্ছে। তাঁদের আশঙ্কা এই 'নোংরা টাকা'-র জোরে আমেরিকার গোটা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার টিকে থাকা খোলসটারও মৃত্যুঘণ্টা বাজতে চলেছে অচিরেই। এই 'নোংরা টাকা'র মালিকদের প্রবল শক্তিশালী দাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজবিদরা আমেরিকান ধনকুবের 'কোচ ব্রাদার্স'এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এখন বলছেন, এই গোষ্ঠীর টাকার দাপটে একসময় চালু থাকা অবাধ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

সমাজবিদরা অবাক হয়ে দেখছেন, এইসব ধনকুবেররা টাকা ঢেলে নানা রকম পেটোয়া সামাজিক সংস্থা খুলে রেখেছে। যারা সুকৌশলে সমাজে এমন সব চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দিচ্ছে যার ফলে সাধারণ আমেরিকানরা ন্যায় অন্যায় কিছুই আর বুঝতে চাইছে না। অধিকাংশ সাধারণ আমেরিকানই এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, কালো টাকা, সাদা টাকা সবই সমান। ডিক্সন, স্কোকপল প্রমুখ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা দেখাচ্ছেন, এই গুণ্ডা ধনকুবেররা এমন একটা বিশ্ব সমাজব্যবস্থা চায়, যেখানে নিয়ম শৃঙ্খলা বলে কিছুই থাকবে না। জনসাধারণ বিজ্ঞান, আবহাওয়ার পরিবর্তন, স্বাস্থ্যসুরক্ষা কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করবে না। এমন একটা নৈরাজ্যবাদী সমাজভাবনার প্রসারের জন্য তারা অজস্র অর্থ ঢালছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রম, গবেষণার বিষয়বস্তু সমস্ত কিছুকে এমনভাবে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা হচ্ছে যাতে পুঁজিপতিশ্রেণির অবাধ শোষণ টিকিয়ে রাখার পরিপূরক চিন্তাধারার প্রসার সমাজে ঘটানো যায়। সেই উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন ফাউন্ডেশন তৈরি করে তাদের মাধ্যমে মোটা অর্থ সাহায্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও কিনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এরা অনুগত অধ্যাপক, গবেষক, বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন সম্মেলনে পাঠাচ্ছে, যাঁরা প্রচার করছেন যে, বিশ্ব উষ্ণায়ন, বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত কার্বনডাইঅক্সাইড এবং তার ফলে গ্রিন হাউস এফেক্ট, আবহাওয়ার পরিবর্তন এসব নাকি কোনও গুরুতর সমস্যাই নয়। এইসব তত্ত্বের উদগাতাদের বিপুল টাকা দিয়ে পুষছে ধনকুবেররা। নিজেদের অনুগত দল রিপাবলিকান পার্টিকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য গত চার দশক ধরে কোচ ব্রাদার্স খরচ করেছে প্রায় ১৫০০ কোটি ডলার এবং তার মধ্যে ২০১৬-র নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ রিপাবলিকানদের জেতাতে খরচ হয়েছে ৯০০ কোটি ডলার। ডিক্সন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, আগামী ২০৩০ বা তার আগেই হয়তো দেখা যাবে আমেরিকার এককালের ভুবনবিখ্যাত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পুরোপুরি মৃত্যু ঘটেছে এবং দেশ শাসন করছে কোনও চরম দক্ষিণপন্থী একনায়ক। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, পৃথিবীর আরও অনেক গণতান্ত্রিক দেশেরই সাধের পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার একই হাল বলে তাঁরা দেখাচ্ছেন।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন উদারমনের বুর্জোয়া মানবতাবাদী তাত্ত্বিকরা অনেকেই আজও এই বিশ্বাস নিয়ে চলেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও কোনও মানবকল্যাণকামী, সৎ রাষ্ট্রনায়ক এবং দলকে যদি ভোটে জেতানো যায় তা হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে। তাতে বিশ্বজোড়া এই শোষণ, অসাম্য, অনাহার, দারিদ্র, যুদ্ধ ইত্যাদি অভিশাপকে দূর করা সম্ভব। হেনরি ডিক্সন প্রমুখের মন্তব্য প্রমাণ করছে, এঁদেরও বর্তমানে তথাকথিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং তার স্বনিযুক্ত অভিভাবক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মোহভঙ্গ হচ্ছে।

মরণোন্মুখ অবক্ষয়ী একচেটিয়া পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদ কায়েম করার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় সমাজজীবনের সর্বত্র যেভাবে তার টাকার দাপট খোলাখুলিভাবে প্রয়োগ করছে তাতে তাঁরা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এই সমাজবিদরা এরকমও মনে করছেন যে, আমেরিকায় সামাজিক হিংসা এমনই উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছেছে, সে দেশে যে কোনও সময়ে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে। খোদ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনই বলেছেন, আমেরিকায় হিংসা একটা সামাজিক নিয়মে পরিণত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় প্রতি ১০০ জন নাগরিকের হাতে আছে ১২০টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রতিদিন ৩০ জনেরও বেশি নাগরিক গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। সব মিলিয়ে সাধারণ বন্দুকবাজ গুণ্ডা ও গুণ্ডা ধনকুবেরদের দাপটে আমেরিকার স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, অবাধ প্রতিযোগিতার স্বর্গরাজ্যের আজ যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, শান্তি আন্দোলনের নেতা জন স্কেলস আভেরির মতে, 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এখন আর জনগণের মধ্য থেকে, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য গঠিত নয়। বরং জনগণের ওপর চেপে বসা, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিক এবং একচেটিয়া ধনকুবেরদের দ্বারা পরিচালিত সরকার।' যদিও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এই রূপ একশো বছর আগেই তুলে ধরেছেন, মহান লেনিন, তিনি বলছেন, "তোমরা বল তোমাদের রাষ্ট্রে স্বাধীনতা অবাধ, কিন্তু ... এই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রটি যতই স্বাধীনতার বড়াই করুক তা শ্রমিকদের দমনের জন্য পুঁজিপতিদের হাতে হাতিয়ার, তার আপাত চেহারাটি যত অবাধ, ততই তার দমনমূলক চরিত্রটি প্রকট। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল ইউরোপে সুইজারল্যান্ড আর আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ... এখানে শ্রমিক যদি তার জীবনমানের সামান্য উন্নতি ঘটানোর দাবি করে তা হলেই গৃহযুদ্ধ চাপানো হয়। ... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা সুইজারল্যান্ডে যত নির্মমভাবে শ্রমিক আন্দোলন দমন করা হয় তেমনভাবে দুনিয়ায় আর কোথাও হয় না। আবার এখানকার সংসদে পুঁজির প্রভাব যত তীব্র তেমনটি দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। পুঁজি এখানে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, শেয়ারবাজার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। সংসদ, নির্বাচন এ সবই তাদের হাতের পুতুল।" (ভি আই লেনিন, ১৯১৯ সালের ১১ জুলাই, শার্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ)

তবে শুধু আমেরিকা নয়, ভারত সহ সব বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ছবিটা একই রকম। ভারতে কী ভাবে কেন্দ্র রাজ্য সব সরকারই খোলাখুলিভাবে একচেটিয়া মালিকদের প্রত্যক্ষ নির্দেশে চলছে, কোন দল সরকার গড়বে, কে কে মন্ত্রী হবে, এ

সাতের পাতায় দেখুন

নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি

একের পাতার পর

নারদা স্টিং অপারেশনে তাদের কয়েকজন সাংসদকে কোটি কোটি টাকার ঘুষ দেওয়ার ছবিও সংবাদমাধ্যমে এসেছে। কলকাতার রাস্তায় ত্রিফলা ল্যাম্প বসানোকে কেন্দ্র করেও তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। এগুলি ছাড়াও আঞ্চলিক স্তরে নানা দুর্নীতি চলছে। ১০০ দিনের কাজ নিয়ে দুর্নীতি, আবাস যোজনায় ঘর বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে দুর্নীতি সর্বত্র চলছে। নদীবাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় ঘুষ না দিলে, কাটমানি না দিলে বহু ক্ষেত্রে কাজই হয় না। মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। তাদের পরিচালিত সিন্ডিকেট-রাজের দাপট রাজ্যের জনজীবনে একটা ত্রাসের মতো দেখা দিয়েছে। আর আঞ্চলিক স্তরেও তাদের বড়-ছোট-মেজো নেতাদের হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ধনী হয়ে কীভাবে রাজকীয় প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা, এখন তার নানা প্রতিবেদন সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে।

এই দুর্নীতির ফলে বঞ্চিত প্রার্থীরা, যাঁদের অনেকেই প্যানেলভুক্ত হয়েও চাকরি পাননি, তাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। দুর্নীতির কথা জানা মাত্রই পথে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে মিছিল করেছে, বিক্ষোভ দেখিয়েছে। পক্ষপাতমুক্ত তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

কিছু রাজনৈতিক দলও এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে দেখা যায়, এই সব দল কিছু দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব, আবার কিছু দুর্নীতি দেখেও দেখতে পায় না। যে বিজেপি এ রাজ্যে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলছে, বিবৃতি দিচ্ছে, সে কিন্তু একটি বারও অন্যান্য রাজ্যে দুর্নীতির প্রসঙ্গ আনছে না। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে দুর্নীতির চেহারা কী? মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের আমলে 'ব্যাপম কেলেঙ্কারি' ভারতের বৃহত্তম দুর্নীতিগুলির অন্যতম। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, নানা সরকারি চাকরি, ব্যাঙ্ক, শিক্ষক, পুলিশ সহ বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগের পরীক্ষা হয় এই ব্যাপমের মাধ্যমে। এই বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বোর্ড কর্তারা অযোগ্য প্রার্থীদের ভর্তি করিয়েছেন এবং চাকরি দিয়েছেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের দুর্নীতিও ভুরি ভুরি। শত শত কোটি টাকার হাওয়ালা কেলেঙ্কারি, বোফর্স কামান কেলেঙ্কারি, টেলিকম কেলেঙ্কারি, কয়লা কেলেঙ্কারি সহ কত দুর্নীতি রয়েছে তালিকায়। সিপিএম আমলে দুর্নীতি কেমন ছিল? সিপিএম আমলের প্রথম দিকে শিক্ষক নিয়োগ হত ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে। সেখানেও লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে কম নম্বরের প্রার্থীরা নিয়োগপত্র পেয়ে যেত অনায়াসেই। যোগ্য প্রার্থীদের নানা ছল চাতুরির আশ্রয়ে ইন্টারভিউতে বহুক্ষেত্রে আসতেই দেওয়া হত না। দলবাজি, স্বজন-পোষণ মারাত্মক রূপ নিয়েছিল। ভুক্তভোগী মানুষ এ সব জানেন। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ যে সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিল, তার অন্যতম ক্ষোভের কারণ ছিল এই জায়গায়। মানুষ এর পরিবর্তন চাইছিল। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন এলেও দুর্নীতির বন্যায় বাঁধ পড়েনি। তৃণমূল সরকারের এই নিয়োগ দুর্নীতি সেই তালিকায় নবতম সংযোজন।

মার্কসবাদী বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই দুর্নীতির আঁতুড় ঘর। কিন্তু তার দ্বারা এটা বোঝায় না এই ব্যবস্থার মধ্যে থাকলেই সকলে দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। কারা দুর্নীতিগ্রস্ত হবে? যারা এই শোষণমূলক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ বা তদারকির দায়িত্বে থাকবে, সেই রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক হবে তার অংশীদার হবে, তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হবেই। নীতিহীন রাজনীতির রাস্তায় থাকলে অনৈতিক পথে যে কোনও উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি করা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে। দুর্নীতি মুক্ত থাকতে গেলে, দুর্নীতিকে রুখতে গেলে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আন্দোলনের শরিক হওয়া আজ অত্যন্ত জরুরি।

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে স্বাস্থ্যকর্মীদের দু'দিন ব্যাপী ধরনা বাঙ্গালোরে

গত মার্চ মাসে ৬ হাজার ৪৬৩ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে ছাঁটাই করে দিয়েছে কর্ণাটকের বিজেপি সরকার। এঁরা করোনা অতিমারিতে জীবন বিপন্ন করে রোগীদের সুস্থ করে তুলেছেন। ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মী ৮-৯ এপ্রিল ধরনা অবস্থানে সামিল হন এবং তাঁদের কাজে বহাল রাখার দাবি জানান। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত একটি যুক্ত মঞ্চের উদ্যোগে স্বাস্থ্যকর্মীরা এই ধরনায় দাবি তোলেন, অবিলম্বে ছাঁটাইয়ের নির্দেশনামা বাতিল করতে হবে। অতিমারির সময়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রক তাঁদের যে সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ করেছিলেন তা বহাল রাখা এবং বকেয়া এরিয়ার সহ বিপন্ন-জীবন ভাতা হিসাবে তাদের প্রাপ্য মেটানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য নেতা সহ এক প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দাবিপত্র দেন। দেখা যাক, রাজ্যের বিজেপি সরকার করোনা যোদ্ধাদের প্রতি কী মর্যাদা দেখায়!

কোন দায়িত্বটা পালন করছে বিজেপি সরকার

একের পাতার পর

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ৬৮ থেকে ৮৬ ডলারের মধ্যে ঘোরাফেরা করা সত্ত্বেও পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানো হয়নি। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এতটা নামায় দেশে পেট্রোপণ্যের দাম তো কমার কথা। অথচ আমদানি খরচ বাড়ার অজুহাত দিয়ে দাম বাড়ানো হচ্ছে বিপুল হারে। এর দায় অস্বীকার করতে পারে বিজেপি সরকার?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধির অজুহাতে মানুষকে বোকা বানানোর এটা একটা কৌশল মাত্র। দেশে পেট্রোপণ্যের বিপুল দাম বৃদ্ধির আসল কারণ এটা নয়, আসল কারণ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিপুল ট্যাক্স আর একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির মুনাফা-লিপ্সা, যা বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখিয়েছি।

এবার আসা যাক সরকারের দ্বিতীয় যুক্তিতে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নাকি দামবৃদ্ধির কারণ। অথচ খবরে উল্টোটাই প্রকাশিত হয়েছে। রাশিয়ায় অপরিশোধিত তেল (ব্রেন্ট ক্রুড)-এর উৎপাদন বিপুল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আমেরিকা ও ইউরোপ নিষেধাজ্ঞা চাপানোয় সেই তেল কিনছে না বহু দেশ। সেজন্য রাশিয়া সে দেশের সর্বোচ্চ মানের অপরিশোধিত তেল 'ইউরালস' বিপুল ছাড় দিয়ে ব্যারেল প্রতি মাত্র ৩৫ ডলারে বেচতে চাইছে ভারতকে। এমনকি এর থেকেও কম দামে কেনার প্রস্তাব দিচ্ছে রাশিয়া। তা নিয়ে রুশ তেল সংস্থা রসনেফ্ট পিজেএসসি এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মধ্যে কথা চলছে। সস্তায় রাশিয়ান গ্যাসও পাওয়া যাচ্ছে। সেই তেল দেশে সস্তায় বিক্রি না করে মোদি সরকার তেলের লাগাতার দামবৃদ্ধিতে রাবারস্ট্যাম্প দিয়ে চলেছে। এতে সরকারের লাভ। পেট্রোপণ্য থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স আদায় করে। পেট্রোপণ্যের দাম যত বাড়বে, ততই বাড়বে সরকারের ট্যাক্স, তত সরকারি কোষাগার ফুলে-ফেঁপে উঠবে। সেজন্য পেট্রলে প্রতি ১০০ টাকায় ৫৬ টাকাই হল কেন্দ্র ও রাজ্যের ট্যাক্স। আর ডিজেলে ১০০ টাকায় ৫১ টাকা হল দুই সরকারের ট্যাক্স। তাহলে কি দামবৃদ্ধির দায় সরকার অস্বীকার করতে পারে? সরকার একদিকে বাজারের হাতে দাম নিয়ন্ত্রণের ভার ছেড়ে দিয়ে বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলিকে বিপুল লাভ করতে দিচ্ছে। অন্যদিকে চড়া কর বসিয়ে নিজেরাও জনগণকে লুটছে। ফলে সরকারের সহযোগিতায় রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলি তো বটেই, পেট্রোপণ্য থেকে বিপুল মুনাফা লুটছে এসার, আম্বানির রিলায়েন্স গোষ্ঠী, আদানি গোষ্ঠী ইত্যাদি।

রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল ২০২১-২২ অর্থবর্ষে তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ৫, ৮৬১ কোটি টাকা লাভ করেছে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকে ১ হাজার কোটি বেশি। আর যে একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির দুঃখে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে তাঁর দলের মন্ত্রীরা চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না, তাদের লাভের পরিমাণ শুনলে চমকে উঠবেন! রিলায়েন্সের ২০২১-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকেই শুধু লাভ বেড়েছে ৪৩ শতাংশ, লাভের পরিমাণ ১৩ হাজার ৬৮০ কোটি। বিজেপি সরকার-তেল কোম্পানিগুলির দুষ্ট চক্রের শোষণে সাধারণ মানুষ আরও হতদরিদ্র হচ্ছে। এই কাজে সঙ্গত দিচ্ছে জনস্বার্থ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা না ঘামানো রাজ্য সরকারগুলিও।

আজ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে সাধারণ মানুষের। এর থেকে তারা মুক্তি চাইছে। কিন্তু কোন পথে আসবে মুক্তি? সাধারণ মানুষের দুরবস্থা নিয়ে পুঁজিবাদী সরকারগুলির কোনও দুশ্চিন্তা নেই। এই অবস্থায় সরকারের জনগণের প্রতি দায়িত্বহীনতা, প্রতারণার জবাব দিতে প্রয়োজন সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। যে পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা মানুষকে খাদের কিনারে টেনে এনেছে, তার সমূলে উচ্ছেদের লক্ষ্যেই এই আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। এ ছাড়া সাধারণ মানুষের বাঁচার কোনও রাস্তা নেই। এটাই যে একমাত্র রাস্তা তা বুঝিয়ে দিয়েছে দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন।

পাট্টার দাবিতে নকশালবাড়িতে বিক্ষোভ

জমির পাট্টার দাবিতে ১৩ এপ্রিল মেচি কৃষিজমি বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে দার্জিলিং-এর নকশালবাড়ি বিএলআরও-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নকশালবাড়ি মহিষহাটি থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল নকশালবাড়ি বাজার পরিক্রমা করে থানা, পানিঘাটা মোড়, বিডিও অফিস হয়ে বিএলআরও অফিসে বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের সভাপতি কৃষ্ণবাহাদুর শাস্ত্রীর নেতৃত্বে পাঁচজনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেন।

জলপাইগুড়িতে জেলা রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

'সমাজতন্ত্রই বাঁচার একমাত্র পথ' পুস্তকটির উপর ২-৩ এপ্রিল জলপাইগুড়ি জেলার কর্মীদের নিয়ে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় রাজগঞ্জ শহরে। মূল আলোচক ছিলেন এসইউসিআই(সি) পলিটবুরো সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল, রাজ্য কমিটির সদস্য, জেলার প্রবীণ কমরেড তপন ভৌমিক এবং জেলা কমিটির সদস্য ও প্রবীণ নেতা কমরেড জয়দেব মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ২ এপ্রিল রাজগঞ্জ শহর সহ জেলার প্রায় সর্বত্র প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা করেও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুই শতাধিক পার্টিকর্মী ও সংগঠক ক্লাসে উপস্থিত হন এবং আগ্রহ সহকারে আলোচনা শোনেন। ৩ এপ্রিল একটি সুশৃঙ্খল মিছিল রাজগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে।

ঘাটশিলায় শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল ফ্রি মেডিকেল সেন্টারের উদ্বোধন

ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল শিশু উদ্যানে শুরু হল 'শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল ফ্রি মেডিকেল সেন্টার'। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জনক ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ এপ্রিল এই সেন্টারের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্বেতা দেও, ডাঃ বিমলেশ কুমার, ডাঃ তাপস মাহাত, বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ ডাঃ রতন কুমার দে, ডাঃ গৌরাঙ্গ মাহাত, শিলাজিৎ সান্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। প্রথম দিন প্রায় ৯০ জন রোগীর চিকিৎসা হয়। প্রতি রবিবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলবে। মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আসবেন। বিনামূল্যে ওষুধ ও কিছু ক্ষেত্রে চশমা দেওয়ার পরিকল্পনাও আছে বলে সংগঠকরা জানিয়েছেন।

'পথিকৃৎ'-এর উদ্যোগে আলোচনাসভা

পথিকৃৎ-এর উদ্যোগে ১৫ এপ্রিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ হলে 'ভারতে জাতবর্ণ ও দাসপ্রথা : উদ্ভব ও বিবর্তন ও বর্তমান রূপ' বিষয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট বামপন্থী জননেতা রবীন সমাজপতি ছিলেন মুখ্য আলোচক। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। পথিকৃৎ পত্রিকার অন্যতম পরিচালক স্বপন ঘোষাল উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের মতামত

মানসিকতার দুর্বৃত্তায়ন

আক্রমণ, প্রহার, জখম, ধর্ষণ, হত্যা ও গণহত্যার উৎস কী? একই মানুষ তো একই সাথে সব অপরাধ বয়ে নিয়ে বেড়ায় না। অপরাধের ছোট ছোট স্তর অতিক্রম করতে করতে যখন কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মননে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি লাভের উদগ্র বাসনা অনুভূত হয় তখনই তো তার প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হয়। প্রথমে চলে পরিবার-পাড়া-অঞ্চলের মধ্যে শাসকের রাজনৈতিক পরিসরে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। ধাপে ধাপে অন্যের প্রতি খবরদারি, দাদাগিরি, গুন্ডামি। পরিসর বাড়তে বাড়তে সরকারি প্রকল্পের টাকা চুরি, গোষ্ঠী বানিয়ে এলাকায় জল, জঙ্গল, জমি, মাটি, পাথর, বালি, কয়লা, ইমারতি দ্রব্য কেনা বেচার উপর একচ্ছত্র দখলদারি, দুর্নীতি, ধাপে ধাপে সরকারি মদতে পুকুরচুরি, ব্যবসায়ীদের থেকে তোলা আদায়, সম্পত্তি দখলের মধ্যে দিয়ে এলাকায় গুন্ডাদের নায়কে রূপান্তরণ। একই পরিবারে, একই পাড়ায়, অঞ্চলে, ক্ষমতার উদগ্র বাসনায় পাশাপাশি ছোটো বড় গোষ্ঠী গজিয়ে ওঠে। কার হাতে কত রাজনৈতিক ক্ষমতা, কত অর্থ, কত পেশিশক্তি এই নিয়ে চলে জনপ্রিয় কথাবার্তা। গোটা সমাজ, ধনী-দরিদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষই এই জনপ্রিয় আলোচনায় দিন, মাস, বছর অতিক্রম করে। এই জনপ্রিয়তার মধ্যেই ব্যক্তি ও পরিবার তাদের কেরিয়ার খুঁজতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অপরিণত রাজনৈতিক জ্ঞানের ফলে লোভ ও ক্ষমতালোভের সমুদ্রে গভীর খাত কোথায় তা যুবকেরা খুঁজে পায় না। এই অবস্থাতেই দরিদ্র-হতদরিদ্র, হাত-পা সর্বস্ব শ্রমিক, প্রান্তিক কৃষক, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার যুবকেরা শাসকদলের নেতাদের লেজুড়ে পরিণত হয়। ভিড় করতে থাকে শাসকদলের স্থানীয় অফিস, পঞ্চায়েত, ব্লক ও শহরাঞ্চলের সমাবেশে। চূড়ান্ত অভাবের জ্বালা ও যথার্থ শিক্ষার অভাবে প্রবৃত্তিগত চাওয়া-পাওয়াগুলো এদের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে। মদ, পর্নোগ্রাফি ও যৌনতার প্রবৃত্তিগত নেশায় তারা শাসকের ছত্রছায়ায় নিয়ন্ত্রণহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এদের নারী-শিশু-বৃদ্ধদের প্রতি চোখের চাউনি বদলে যায়। অন্ধকার-আবদ্ধপরিবেশে এই যুবকেরা জীবন যাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সুযোগ পেলে এলাকার মাফিয়া ও ধাপে ধাপে এই চূড়ান্ত ক্ষমতালোভী সমাজবিধ্বংসী ভোগবাদী রাজনীতিই হয়ে ওঠে এদের জীবনদর্শন। এরা যা কিছু ভালোবাসে তা শুধু নিজের জন্য। এমনকি নিজের বাবা-মা-স্ত্রী-সন্তানকেও এরা প্রকৃত অর্থে ভালোবাসে না। ভালোবাসে শুধু নিজের ভোগের জন্য। ক্রমে এদের উগ্রতা চূড়ান্ত মাত্রা পায়। পাশাপাশি এই যুবকদের উদ্যোগে এলাকায় শাসকের প্রত্যক্ষ মদতে গোষ্ঠী তৈরির চেষ্টা চলে।

ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রদর্শনের উগ্র ঝোঁক থেকে এই যুবকেরা এলাকায় ক্ষমতা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ও মারধর এদের জীবনযাপনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। কখনও কখনও আঘাত পেয়ে প্রত্যাঘাত দিতে না পারলে বা চুরি-দুর্নীতিতে সন্তোষজনক ফল না মিললে পাল্টা আঘাতের জন্য এরা মুখিয়ে থাকে। এই পর্যায়ে যদি শাসকদল বদলের পালা চলে, অপরাধের উৎস খোঁজা বা নির্মূলের বদলে 'অতীতের শাসকের থেকে বর্তমান শাসক ভালো, বা বর্তমান শাসকের থেকে অতীতের শাসক ভালো'—এই চর্চায় জনতা মশগুল হয়ে পড়ে। শিক্ষিত-অতি শিক্ষিত ডিগ্রিধারী দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ এদের দলবদল দেখে মুখরোচক গল্পে, কখনও কখনও হাততালি দিয়ে সমাজকে অতি সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়। বুর্জোয়া মিডিয়া ও শাসক দল যে আসলে এটাই চায়, ঘটনার স্রোতে, মুখরোচক গল্পের খপ্পরে পড়ে বহু ক্ষেত্রে জনতার তা উপলব্ধিতে আসে না।

এই অবস্থায়, ভোট যত এগিয়ে আসে বা ভোট পার হলে সরকারি ক্ষমতা দখল ও প্রতিশোধের লড়াই তীব্রতর হয়। এই পর্যায়ে হত্যা ও গণহত্যা ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর মানসিকতায় স্থায়ী জায়গা করে নেয়। মানবমনে পাশব প্রবৃত্তি সর্বোত্তম রূপে প্রতিফলিত হয়। নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউই রেহাই পায় না। উগ্রতার আনন্দে ধর্ষণ ও খুন ধনতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বের নয়া সংযোজন হয়ে দাঁড়ায়। পাশব প্রবৃত্তির ইতিহাসে জায়গা করে নেয় কংগ্রেস, সিপিআইএম, বিজেপি, তৃণমূল সহ এদেশের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শাসকেরা। গড়ে ওঠে মরিচঝাঁপি, মৈপীঠ, কুলতলি, জয়নগর, নেতাই, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নানুর, সূচপুর, ছোট আঙারিয়া ও বগটুই।

একসাথে অনেক বন্ধু-সহপাঠী মিলে শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করেছি নিম্ন মধ্যবিত্ত অর্থনীতির পরিসরে। আর্থ সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছোটো ছোটো অগণিত ঘটনার সাক্ষী আমরা। এ সমাজ ও শাসকসুলভ রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বড়ই নির্মম। অপরাধের শেকড় খুঁজতে গিয়ে প্রতিনিয়তই পাচ্ছি সেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিপুষ্ট রাজনীতি, ক্ষমতা, লাভ, প্রবৃত্তি আর প্রতিহিংসাপরায়ণতার সীমাহীন উগ্রতা ও উন্মত্ততা। অগণিত মেহনতি মানুষের অসহায়ত্ব যেন দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই সেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রতি তীব্র ধিক্কার জানাতে আবেদন জানাচ্ছে।

রাজীব সিকদার
ভবানীপুর, কলকাতা-২৫

লুঠেরা ধনকুবেরদের হাতেই ব্যাঙ্ক তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার

আবারও প্রতারণার শিকার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। নীরব মোদী-মেহুল চোক্সী কাণ্ডের ১৪ হাজার কোটি টাকা প্রতারণার ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে আরও ধাক্কা এসে পড়ল পিএনবি-র উপর। 'আইএল অ্যান্ড এফএস তামিলনাড়ু পাওয়ার' নামে একটি সংস্থা পিএনবি থেকে ২০৬০.১৪ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে তা আত্মসাৎ করেছে। ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের ঋণ অ্যাকাউন্টকে 'স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট (এসএমএ) হিসেবে চিহ্নিত করেছে পিএনবি। একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত কোনও ঋণের আসল অঙ্ক অথবা সুদ কোনওটাই না মেটানো হলে, সেই অ্যাকাউন্টকে এসএমএ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পিএনবি এই ধাক্কা কতখানি সামলাতে পারবে তার চেয়েও বড় প্রশ্ন কী উপায়ে সামলাবে? হয় ব্যাঙ্কের লাভের থেকে কিংবা সরকারি তহবিল থেকে এই ঋণ পরিশোধ হবে। উভয় ক্ষেত্রেই জড়িয়ে আছে আমজনতার স্বার্থ। বলা বাহুল্য, এসব বড় বড় ঋণের ক্ষেত্রে সরকারের একটা ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে থেকেই থাকে। সরকারি মদতে বিজয় মাল্য, নীরব মোদী, মেহুল চোক্সীরা যেমন আপাত নিরাপদ আস্তানা খুঁজে নিতে পেরেছে, তেমন সরকারি বদান্যতার হাত এই প্রতারকদের দিকেও প্রসারিত হবে না, তা জোর দিয়ে বলা যায় না।

গত ১৩ বছরে অর্থাৎ ২০০৮-০৯ থেকে ২০২০-২১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট কার্যকরী (অপারেটিং) লাভ ছিল ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪৫৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার ১ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ পরিশোধের জন্য আলাদা করে রাখতে হয়েছিল। আর একটি হিসাবে দেখা যায়, ২০০১ থেকে ২০২১, এই ২১ বছরে দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৬০ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে দুর্বল করা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়াকে জোরদার করা হচ্ছে। অথচ ইতিহাস হল, ১৯১৩ থেকে ১৯৬৮, এই ৫৬ বছরে ২১৩২টি বেসরকারি ব্যাঙ্ক নানা কারণে ফেল করেছে। ডুবে গিয়েছে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ। কর্মচারীরা হারিয়েছেন তাঁদের কাজ। ১৯৬৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক, ভারত ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মী বিলাস ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্কের মতো ২৫টি মরণাপন্ন বেসরকারি ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে এসবিআই, পিএনবি, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মতো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এগিয়ে গিয়েছে।

কর্পোরেট কর্তাদের ঘনিষ্ঠমহল প্রচার করছে, ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ কমানোর অন্যতম উপায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ। বলা হচ্ছে, প্রকল্পের ঝুঁকি, সংস্থার আর্থিক পরিস্থিতি কিংবা ওই প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব যাচাই করে তবেই কোনও সংস্থাকে বড়সড় ঋণ দেয় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি যা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি করে না। সে কারণেই নাকি বেসরকারি ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তুলনায় কম। এটা একেবারেই মিথ্যা প্রচার। প্রথমত, যে কোনও বড় ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রকল্পের খুঁটিনাটি বিচার করতে হয় সব ব্যাঙ্ককেই। সেখানে ভুল-ত্রুটি থাকে না এমন নয়। তবে এর বাইরে যা থাকে তা হল শাসক দলের নেতা-মন্ত্রী এবং আমলাদের অবৈধ যোগসাজশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ দিতে বাধ্য করা। দ্বিতীয়ত, অনুৎপাদক সম্পদের সমস্যা বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতেও কম নয়। সম্প্রতি ঋণখেলাপির আর একটি বড় উদাহরণ হল গুজরাতের এবিজি শিপইয়ার্ড সংস্থার ২২,৮৪২ কোটি টাকা প্রতারণা। এটিই আপাতত সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক প্রতারণা। মোট ২৮টি সরকারি বেসরকারি ব্যাঙ্ক এই খেলাপির ভুক্তভোগী। এর মধ্যে বেসরকারি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের লোকসানের পরিমাণ ৭০৮৯ কোটি টাকা। এর পরই রয়েছে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, এসবিআই, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পিএনবি, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, যাদের লোকসানের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬৩৪, ২৪৬৮, ১৬১৪, ১২৪৪, ১২২৮ কোটি টাকা।

দেশে মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ৭০ শতাংশ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে মোট জমা টাকার পরিমাণ ১০০ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। সরকারের সহায়তায় এই বিশাল পরিমাণ টাকার নিয়ন্ত্রক হতে চাইছে এদেশের ধনকুবের গোষ্ঠী। বলা বাহুল্য, এই টাকার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে ব্যাঙ্কগুলি। ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ ক্রমবর্ধমান। এই ঋণ না আদায়ের ফলে এগুলি ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ বা এনপিএ-তে পরিণত হচ্ছে। এই সম্পদ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে দিনে দিনে দুর্বল করে দিচ্ছে। এই অনাদায়ী ঋণের সিংহভাগ হল বৃহৎ পুঁজির মালিকানাধীন বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার। এনপিএ কমাতে সরকার বহু ক্ষেত্রে বড় বড় কর্পোরেটে ঋণ মকুব করে দিচ্ছে। গত তিন অর্থবর্ষে মোট 'রাইট অফ' বা ঋণ মকুবের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা। অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা কমানোর নামে এখন আবার 'ব্যাড ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে এনপিএ কমার সম্ভাবনা নিয়ে অর্থনীতিবিদরাও কোনও আশার আলো দেখাতে পারছেন না। এদিকে আবার কর্পোরেটে ঋণ আদায়ে সরকার দেউলিয়া বিধি এনেছে। এই বিধি অনুযায়ী ঋণখেলাপি সংস্থাগুলিকে দেউলিয়া ঘোষণা করার দাবি নিয়ে ব্যাঙ্কগুলি আদালতে যাবে। তারপর উক্ত সংস্থা নিলামে তুলে তারা বকেয়া পাওনা উদ্ধার করতে পারবে। এর মধ্য দিয়েও বাস্তবে কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে। এসার, ভূষণ স্টিল, ডিএইচএফএল, ভিডিওকন সহ ১৩টি বড় বড় কোম্পানি বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেনি। সরকারের অনুৎপাদক সম্পদ কমানোর লক্ষ্যে আনা দেউলিয়া আইনে রফা হয়েছে, মোট ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৮২০ কোটি টাকা দিলে সবাইকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এর ফলে ব্যাঙ্কগুলির ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াল ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা। অর্থাৎ কর্পোরেটদের সুবিধা দিতে ব্যাঙ্কগুলিকে ৬৪ শতাংশ ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যেই চলছে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের তোড়জোড়। এর মধ্য দিয়ে জনগণের অর্থকে আরও যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যাবে এই কর্পোরেট সংস্থাগুলি। বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলিকে দুর্বল করার জন্য যারা মূলত দায়ী ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের পরে তারাই হয়ে যাবে ব্যাঙ্কের মালিক। জনস্বার্থেই ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও সাধারণ গ্রাহকরা এই সর্বনাশা বেসরকারিকরণের নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় না নামলে অচিরেই গরিব-মধ্যবিত্তের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ের পুরোটা ঢুকবে ধনকুবেরদের সিন্দুকে।

পঞ্চ ভয়ঙ্করী

অর্থনীতিবিদেরা লিখছেন, 'পুঁজিবাদের স্বাস্থ্যই এখন মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।' আজ বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলো সভ্যতাকে পরের শতাব্দীতে পৌঁছে দেওয়ার খোয়াব দেখাচ্ছে। তারা নাগরিক সমাজকে আশ্বস্ত করতে চাইছে যে সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করে আক্ষরিক অর্থেই তারা 'স্বর্গে পৌঁছাতে পারে'।

বাস্তবে, কেবলমাত্র এলন মাস্ক (টেসলা মোটরস এর কর্তা), জেফ বেজস (অ্যামাজনের কর্তা) এবং রিচার্ড ব্রানসনের (ব্রিটিশ ধনকুবের) আকাঙ্ক্ষাই তাদের ব্যক্তিগত রকেটে চড়ে মহাশূন্যে আছড়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে। আর আমরা হতভাগারা তাদের রকেটের পরিত্যক্ত ধোঁয়ায় মাথা ঘুরিয়ে, চোখ ধাঁধিয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করি।

চিনও মহাকাশে একটা প্রাসাদ গড়ার স্বপ্ন দেখছে। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে বেজিং-এ স্বর্গের মন্দির তৈরি হয়েছিল, যেটা সে দেশের দর্শনীয় স্থান হিসাবে অন্যতম। সত্যি বলতে কি, তাদের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিচালিত হচ্ছে পৌরাণিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। তারা অভিযাত্রী সহ মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটা মহাকাশযান বানিয়ে নাম দিয়েছে সেনঝৌ (ঐশ্বরিক ভূমি) এবং পৃথিবীর নিকট কক্ষপথ বরাবর একটি মহাকাশ স্টেশন তৈরি করে তার নামকরণ করেছে তিয়াংগং (স্বর্গীয় প্রাসাদ)। স্পষ্টতই, চিন মহাকাশে তার স্বপ্ন ছড়ানোর সাথে একযোগে পুরাণকথাও ছড়িয়ে দিতে উদগ্রীব। ডিজিটাল যুগ বলে এত ঢাকঢোল পিটিয়ে শেষে এই তার পরিণতি! আসলে বড় বড় বুলির আড়ালে অসমঞ্জস ভাবনার প্রসারটাই এ যুগের নিয়ম।

অ্যামাজন, গুগল, অ্যাপল, মাইক্রোসফট এবং ফেসবুক— এদের 'পঞ্চ ভয়ঙ্করী' (দ্য ফ্রাইটফুল ফাইভ) অভিহিত করে নিউইয়র্ক টাইমসের লেখক ফরহাদ মঞ্জু বলছেন, আমরা কী ভাবে যোগাযোগ করি, কী ভাবে লেনদেন করি, কী ভাবে বিনোদন করি, কোথায় কী খাই এবং কার সাথে বন্ধুত্ব করি সমস্ত ব্যাপারে নাক গলিয়ে এরা জীবনকে কল্পনাতীত ভাবে বদলে দিয়েছে। ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, স্মার্টফোন, নজরদারি ক্যামেরা ইত্যাদি সবকিছু থেকে সহজেই ডিজিটাল তথ্য পাওয়া যায়। বেশি তথ্য মানেই কিন্তু সবসময় সেটা নির্ভরযোগ্য নয়। ডিজিটাল প্রযুক্তি তথাকথিত প্রকাশ্য এবং নিষিদ্ধ সমাজের ফারাকটা অস্পষ্ট করে দিয়েছে।

জ্ঞানজগতে অন্ধত্বও কম উদ্বেগজনক নয়। প্রযুক্তির একনায়কত্ব আর একটি সমস্যা। আমাদের জীবনের প্রতিটি দিক— আমাদের বক্তব্য, আমাদের অভিব্যক্তি, আমাদের রাজনৈতিক ভাবনা-ধারণা এবং ভাবগত অভিরুচি— সবকিছু খুঁড়ে বের করছে এবং পণ্যায়িত করা হচ্ছে। এমন অতন্দ্র প্রহরাবেষ্টিত সমাজে এবং প্রযুক্তির একনায়কত্বের যুগে গণতন্ত্র বলে কিছু থাকে? ইজরায়েলি ইতিহাসবিদ যুভাল নোহ হারারি একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা শুনিয়েছেন। তাঁর মতে তিনি একটা পূর্বাভাস পাচ্ছেন, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি এমন মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে যে, শুকিয়ে যাবে 'সকল মানব সংস্থা এবং এমনকি, মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলো পর্যন্ত'। প্রযুক্তি একটা শাঁখের করাত। একদিকে উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগায়, আবার সঙ্গে বিপর্যয়কে গাঁটছড়া বেঁধে টেনে আনে। একই প্রযুক্তি যা কোটি কোটি মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়, আবার তাদের নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণের আওতায় রাখে। ...

অ্যামাজন, গুগল, অ্যাপল, মাইক্রোসফট এবং ফেসবুক অনেক সরকারের চাইতেও বেশি শক্তিশালী। অবয়বের সাথে সাথেই শক্তি বাড়ে। গুগল এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক রাজনৈতিক অনুদান দেয়। এখন এরা সমস্ত নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে। এদের শেয়ারের দাম এবং মুনাফা বাড়ছে উল্কাবেগে। অধিকাংশই রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় চলছে। এদের কর মেটানোর অস্বচ্ছতা দেখেও সরকার দেখছে না। গত বছর, বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল গাড়িগুলির অন্যতম রোলস-রয়েস রেকর্ড সংখ্যায় বিক্রি হয়েছে। কোভিড অতিমারি চলাকালীন যেখানে অর্থনীতির অচলাবস্থাটাই নিয়ম, সেখানে এই 'পঞ্চভয়ঙ্করী' সহ কিছু অতিকায় প্রযুক্তি সংস্থা রেকর্ড অঙ্কের ব্যবসা করেছে। এইসব অতিকায় প্রযুক্তি সংস্থাকে 'প্যান্ডেমিক ক্যাপিটালিস্ট' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এরা বোধ হয় মনেপ্রাণে কামনা করে অতিমারি চিরতরে স্থায়ী হোক। বড় বড় এইসব টেকনোলজি কোম্পানি উপভোক্তাদের কাছ থেকে তাদের সম্ভাব্য পছন্দ, অপছন্দ এবং আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করে।

ইন্টারনেট একবিংশ শতাব্দীর প্রাণভোমরাতে পরিণত হওয়ার মাশুল হিসাবে, প্রযুক্তি নির্ভর গুণ্ডাগিরি (সাইবার বুলিং), মিথ্যাশ্রয়ী পর্যালোচনা (ম্যানিপুলেটিভ অ্যানালিটিক্স), ভুয়ো খবর এবং কর্তৃত্ববাদী নজরদারির (অথরেটেরিয়ান সার্ভিলেন্স) জন্ম হয়েছে। এটাকে ব্রুক ম্যানভিল 'ডিজিটাল ডেমোক্রেটিক ইউটোপিয়া' বলে অভিহিত করেছেন। কোরিয়ান বংশোদ্ভূত সুইস-জার্মান দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক সংস্কৃতিবিদ ব্যুং-সুল হান বলেছেন, এই হচ্ছে ইন্টারনেট প্রযুক্তি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব যাকে আমরা আমাদের 'আকাঙ্ক্ষিত নিজস্ব আধিপত্য' বলে ভাবতে শুরু করেছি। আমাদের ব্যক্তিগত সব তথ্যই এখন পণ্যায়িত এবং বাণিজ্যিকৃত। আরও একধাপ এগিয়ে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, 'হেগেলীয় পরিভাষায় যাকে দাসপ্রভু-ক্রীতদাস দ্বন্দ্ব বলে তার থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা একই সাথে দাসপ্রভু এবং ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছি।' জনগণ এখন গড্ডলিকা প্রবাহ তৈরির সম্মোহনের খপ্পরে ('মাস ফর্মেশন হিপনোসিস')—জনগণকে এমন একটা স্তরে নিয়ে আসা হচ্ছে যাদের সহজেই মিথ্যাচারে প্রভাবিত করা যায় এবং যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়াই হুজুগের পিছনে ছোটানো যায়।... অচিরেই এরকম সম্ভাবনা তৈরি হবে যে, নির্বাচনের আগে প্রতিটি ভোটার আলাদা আলাদা ভাবে একই প্রার্থীর থেকে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা এবং একটি ভিন্ন প্রচারপত্র পাবে। ফলে রাজনীতি একটি তথ্যনির্ভর বিজ্ঞানে পরিণত হবে। এভাবে বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলো অতিকায় পুঁজিপতিদের মতো সমৃদ্ধ হয়েছে।

বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলো এখন মহামতি সরকারের ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত। তারা কারও পরোয়া করে না এবং কাউকে মেনেও চলে না। তাদের কোনও নির্বাচন লড়তে হয় না। বৈধ ঘুষের কারবার চালিয়ে বড় বড় কর্পোরেটগুলো গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে। নর্থওয়েস্টার্ন এবং প্রিন্সটন গবেষকরা ২০১৪ সালে একটি প্রতিবেদনে দেখিয়েছিলেন, আইন প্রণেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের মতামতের তোয়াক্কা করে না। তারা বেশিরভাগই বড় বড় দাতাদের সেবাদাস। ভারতেও এটাই চলছে। ক্ষমতাধর কর্পোরেটদের লাগাম কষতে ব্যর্থ হলে পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। ধনী-দরিদ্র বৈষম্য আরও বাড়বে এবং তার পরিণতিতে গণতান্ত্রিক রাজনীতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে কেউ কল্পনা করতে পারছে না। ইতিহাসের শিক্ষা বলে, এই সব প্রবণতাই সস্তা জনপ্রিয়তার রাজনীতি, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং চরমপন্থার দিকে নিয়ে যায়। সকলে প্রথম দর্শনেই ইন্টারনেটের চমকপ্রদ প্রযুক্তির প্রেমে পড়ে। এমআইটি-র সমাজবিজ্ঞানী শেরি টার্কেল চমৎকার বর্ণনা করেছেন, "আমরা ছিলাম তরুণ প্রেমিকদের মতো, যারা আলাপ-আলোচনা চাইতাম না। ভেবেছিলাম তাতে রোমান্সটাই মাটি হবে।" এখন এই রোমান্সটা অপরিণামদর্শী প্রেমে উপনীত। "এই তো আলাপ-আলোচনার আসল সময়।"

(দিল্লির ইন্সটিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্স-এর অধিকর্তা আশ নারাইন রাও রচিত এই নিবন্ধটি 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকাতে ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'আগলি লাভ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হল।)

ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপাররা আন্দোলনে

হাওড়া জেলার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অধীন জেলা সহ আরআই দপ্তরে ওয়াটার ও ক্যারিয়ার সুইপার 'কর্মবন্ধুরা' অফিসে গ্রুপ ডি কর্মচারী না থাকায় অফিস খোলা, জল ঝাঁট দেওয়া, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, নোটিস বিলি করা, আরআই-এর তদন্তকাজে ও খাজনা আদায়ে সাহায্য করা, বিভিন্ন অফিসে চিঠি বয়ে নিয়ে যাওয়া এবং দুয়ারে সরকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো দায়িত্ব নিয়ে করেন। এই সব কাজ তাঁরা ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে করে আসছেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের বেতন মাসিক মাত্র ৩০০০ টাকা। দেওয়া হয়নি দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকা।

এর প্রতিবাদে ৫ এপ্রিল হাওড়ার বঙ্গবাসী মোড়ে সমবেত হয়ে তাঁরা প্রথমে ডিএলআরও অফিসে পরে হাওড়া সদর এসডিএলআরও-র নিকট দাবিপত্র পেশ করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন হাওড়া জেলা 'ওয়াটার ক্যারিয়ার অ্যান্ড সুইপার ইউনিয়নের' নেতৃবৃন্দ। ডিএলআরও জানান ইতিমধ্যে উল্লিখিত বকেয়া টাকা দেওয়ার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য উলুবেড়িয়া ও সদর এসডিএলআরও-র কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন।

গণতন্ত্র আজ পুঁজির গুণ্ডাতন্ত্র

চারের পাতার পর

সবই যে ধনকুবের গোষ্ঠীগুলি ঠিক করে দেয়— ভারতে এটা কোনও অজানা তথ্য নয়। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন তবু পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের কর্তারা কিছুটা গণতন্ত্রের ভেক রাখার দায় অনুভব করতেন। এখন সমাজতান্ত্রিক শিবির না থাকায় তারা একেবারে বেপরোয়া। লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, আজকের দিনে "উন্নত ও অনুন্নত উভয় পুঁজিবাদী দেশই ...ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করছে।" তিনি আরও দেখিয়েছেন, "...যখন প্রচলিত স্বাভাবিক অর্থনৈতিক সংগঠন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনযন্ত্র পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সংকট মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে যায়, যখন বাজারের কোনও রকম স্থায়িত্ব রক্ষা করা ও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে, যখন সংকটের ফলে জীবনে অনিশ্চয়তার কঠিন আঘাতে জনসাধারণ বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে— তখন এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের মৌলিক নিয়মকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে বজায় রাখার জন্য, সংসদীয় গণতন্ত্রের আলখাল্লা পরিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির একনায়কত্বকে আড়াল করার যাবতীয় প্রকরণকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এই সব ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ফ্যাসিবাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয়, ... প্রধানত অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত করা এবং প্রশাসনে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক দৃঢ়তা (রিজিড ফার্মনেস) এইগুলি বেশি বেশি করে রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থের একাত্মতা গড়ে তোলে..." (রচনাবলি দ্বিতীয় খণ্ড, সময়ের আহ্বান)।" তিনি আরও দেখিয়েছিলেন, ধনকুবেরদের টাকার জোরে মিডিয়া পাওয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার নির্ধারণ করে ভোটে কে জিতবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে কেউ না মানতে পারেন, কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করার উপায় আছে কি? মার্কসবাদী বিজ্ঞান যে সত্যকে তুলে ধরেছে তাকে বাস্তব সত্যের আলোয় দেখে মানতে বাধ্য হচ্ছেন মার্কিন সমাজবিদরা।

ভ্রম সংশোধন ঃ পশ্চিমবঙ্গে ১০০ টাকার পেট্রলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মোট ট্যাক্স ৫৬ টাকা, ডিজেলে ৫১ টাকা। ভুলক্রমে গত সংখ্যায় পেট্রলে ৬৫ টাকা এবং ডিজেলে ৪২ টাকা ছাপা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক, গণদাবী

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

কাজ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ
ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েই চলেছে দেশে

২০২০-২২ এই দু'বছরে অসংখ্য মানুষ কাজ হারিয়েছেন, বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে। দারিদ্রসীমার নিচে নেমেছে বহু পরিবার। বেকারত্বের হার করোনার আগেই দেশে চার দশকে সর্বোচ্চ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সমীক্ষায় দেখা গেছে, আর্থিক বৈষম্য তীব্র আকার ধারণ করেছে। অক্সফ্যাম ইন্ডিয়ার রিপোর্টে, ধনীতম ১০ শতাংশের হাতে জাতীয় সম্পদের ৪৫ শতাংশ। নিচুতলার ৫০ শতাংশের ভাগে মাত্র ৬ শতাংশ। উপদেষ্টা সংস্থা নাইট ফ্র্যাঙ্কের সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০২০-র তুলনায় ২০২১-এ ভারতে তিন কোটি ডলারের বেশি (প্রায় ২২৬ কোটি টাকা) সম্পদশালী ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। তাতে প্রথম সারিতে রয়েছে কলকাতা, এখানে বেড়েছে ১১.৪ শতাংশ। ২০১৬ সালের তুলনায় বৃদ্ধি ১১৫.৫ শতাংশ।

ছাত্রী নির্যাতনের প্রতিবাদে বোলপুরে বিক্ষোভ

বীরভূমে বোলপুরের পার্শ্ববর্তী মুলুক গ্রামের এক আদিবাসী ছাত্রীর উপর বিপুল টাকার মালিক এবং নানা অসামাজিক কাজের সাথে যুক্ত টিএমসি-র এক পঞ্চায়েত সদস্য ও তার কয়েকজন শাগরেদ দীর্ঘদিন ধরে পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে আসছিল। পরিণামে মেয়েটি মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। তাকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এস ইউ সি আই (সি)-র বোলপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকজন ওই নির্যাতিতার বাড়িতে যান এবং ভয়ঙ্কর ঘটনাটি শোনেন। ঘৃণ্য অপরাধীদের কঠোর শাস্তি এবং নির্যাতিতার উপযুক্ত চিকিৎসা ও অন্যান্য দাবিতে দলের পক্ষ থেকে বোলপুর থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির আহ্বায়ক বিসম্বর মুড়া এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি দাবি জানান, নির্যাতিতা তরুণীর চিকিৎসা ও স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সমস্ত দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী নিগ্রহ, প্রতিবাদ এসডিএফ-এর

সম্প্রতি হাওড়া জেলা হাসপাতালে রোগীর বাড়ির লোকজনদের হাতে আক্রান্ত হন হাসপাতালের এক চিকিৎসক। সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে ১০ এপ্রিল সহসভাপতি ডাঃ সুদীপ দাস, কোষাধ্যক্ষ ডাঃ স্বপন বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি দল আক্রান্ত চিকিৎসকের সাথে দেখা করেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, সরকারি হাসপাতালে সর্বত্র পরিকাঠামোর বিরাট ঘাটতি রয়েছে। তা সত্ত্বেও চিকিৎসকেরা সাধ্যমতো পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি রোগী রেফার সংক্রান্ত সরকারি ভ্রান্ত নীতি এবং পরিকাঠামো ঘাটতির দায় প্রশাসন যেভাবে চিকিৎসকদের উপর চাপাচ্ছে, তার ফলে জনমানসে চিকিৎসকদের প্রতি ব্যাপক ক্ষোভ জন্ম নিচ্ছে। হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপর এই বর্বরোচিত আক্রমণ তারই বহিঃপ্রকাশ। আমরা সরকার ও প্রশাসনের এই চিকিৎসকস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্যবিরোধী পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দাবি, অবিলম্বে পরিকাঠামোর সমস্ত ঘাটতি পূরণ করতে হবে, অবৈজ্ঞানিক রেফার নীতি সংশোধন করতে হবে এবং দোষীদের জামিন অযোগ্য ধারা সহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

নারীনিগ্রহের তীব্র প্রতিবাদ বিশিষ্টজনদের

হাঁসখালিতে নারী নির্যাতনের ঘটনা ও মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের নিন্দায় সোচ্চার হলেন এ রাজ্যের বিশিষ্টজনেরা। নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হাঁসখালি সহ ঘটে চলা নারী নির্যাতনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, যেভাবে পরপর ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ঘটছে, বিশেষত নাবালিকারা বীভৎস অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তা আমাদের আতঙ্কিত করছে, বিবেককে দংশন করছে। যে প্রশ্নগুলি মনকে পীড়িত করছে তা হল, শাসকের রাজনীতি কি কেবল দুর্বৃত্তদের আশ্রয়স্থল? এ রাজ্যে আইনের শাসন, নারীর নিরাপত্তার অধিকার, আহতের চিকিৎসার অধিকার কি অবলুপ্ত হল? আরও বেশি পীড়িত করছে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘটনা-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, নাবালিকা ধর্ষিতার অপমৃত্যুকে 'ছোট ঘটনা' হিসাবে বর্ণনা, ধর্ষিতার 'চরিত্র দোষ' অন্বেষণ প্রভৃতির মাধ্যমে এ রাজ্যকে তিনি কোন পথে চালিত করছেন? হাঁসখালিতে নাবালিকার ধর্ষণ, চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে যন্ত্রণায় মৃত্যু এবং প্রমাণ লোপের উদ্দেশ্যে তার বাবাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে জোর করে শবদেহ দাহ করার ঘটনা, থানায় অভিযোগ করতে না দেওয়া—এ কি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ? হাথরসের যে ঘটনায় সারা দেশ শিউরে উঠেছিল, এ যেন তারই পুনরাবৃত্তি! সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ায় আমরা বাকরুদ্ধ।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন অপর্ণা সেন (বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক), ডাঃ বিনায়ক সেন (বিশিষ্ট সমাজকর্মী), বিভাস চক্রবর্তী (নাট্যব্যক্তিত্ব), কৌশিক সেন (নাট্যব্যক্তিত্ব), মীরাতুন নাহার (সমাজকর্মী), পার্থসারথি সেনগুপ্ত (আইনজীবী), ডাঃ সুশ্রুত বন্দ্যোপাধ্যায়, শতরূপা সান্যাল (চিত্র পরিচালক), অধ্যাপক পবিত্রকুমার গুপ্ত, দিলীপ চক্রবর্তী, কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার (ক্রীড়াবিদ), ডাঃ তরুণ মণ্ডল (প্রাক্তন সাংসদ), অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর (প্রাক্তন বিধায়ক) প্রমুখ।

কমিটির দাবি, হাঁসখালির ঘটনার তদন্তে রাজ্য পুলিশ সিবিআইকে যথাযথ সাহায্য করুক এবং অন্যান্য ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করুক। কামদুনি, পার্ক স্ট্রিট থেকে কুশমণ্ডি—কোথাও দোষীদের চূড়ান্ত শাস্তি হয়নি। এখানে যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। আমরা চাই নারী নিগ্রহহীন বাংলা।

কার্শিয়াং-এ আশাকর্মীর উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ এআইইউটিইউসি-র

কার্শিয়াং ব্লকের আশাকর্মীর উপর পাশবিক নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাতে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এক বিবৃতিতে বলেন, দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং ব্লকের এক আশাকর্মী ১৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীর দ্বারা আক্রান্ত হন। অত্যাচারের পর দুষ্কৃতীরা তাঁকে আহত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়। তিনি এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়িতে একটি হাসপাতালে ভর্তি। কমরেড দাস বলেন, আশাকর্মীদের দিন-রাত কাজ করতে হয়। কর্মক্ষেত্রে তাঁদের নিরাপত্তা নেই। নদীয়ার হাঁসখালি, বীরভূম, পুরুলিয়ার ঘটনার পর এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল যে, এই রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা নেই। কিন্তু প্রশাসন শুধু নির্বিকার নয়, বহু ক্ষেত্রে তারা অপরাধীদের আড়াল করারও চেষ্টা করছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৬ এপ্রিল কার্শিয়াং থানায় বিক্ষোভ দেখান আশাকর্মীরা।

বেতন বঞ্চনার প্রতিবাদ ব্যাঙ্কের ঠিকাকর্মীদের

এস বি আই-এর চুক্তিবদ্ধ কেয়ারটেকার কর্মীদের প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার বেতন অন্যায় ভাবে আটকে রেখেছে ৫টি ভেন্ডার। ২০২০ সালের আগস্ট মাসে এসবিআই-তে ৫টি ভেন্ডার ১০০০ এটিএমে ৪০০০ কেয়ারটেকার দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। এই বছর আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে ভেন্ডাররা প্রতিটি কেয়ারটেকারকে ৩৫০ টাকা করে কম বেতন দেয়। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে একমাত্র এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম সোচ্চার হয় এবং অবিলম্বে বকেয়া বেতন দেওয়ার দাবি জানায়। এই বিষয়ে অন্যান্য সংগঠনগুলোর নীরবতা কেয়ারটেকারদের ভাবিয়ে তুলছে। ভেন্ডারদের সাথে তারা যেভাবে হাত মিলিয়ে চলছে তার বিরুদ্ধে মুখর হয়েছেন কর্মচারীরা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com